আর এস এস বনাম ভারত

৪

নয়া উদারবাদী নীতি
এবং
আর এস এস- বিজেপি

সি পি আই (এম) প্রকাশনা

সূচীপত্র

সাম্প্রদায়িকতা ও নয়া উদারবাদী নীতি
—প্রকাশ কারাত/৩
ফেক ইন ইন্ডিয়া— বিজেপি'র ছদ্ম জাতীয়তাবাদ
—কিরণ /১৩
শ্রমিকশ্রেণি সম্পর্কে আর এস এস'র দৃষ্টিভঙ্গি
— ডা. কে. হেমলতা /২৩

সাম্প্রদায়িকতা ও নয়া উদারবাদী নীতি

প্রকাশ কারাত

কেন্দ্রে মোদি সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়া ক্রমবর্ধমান স্বৈরতান্ত্রিক সাম্প্রদায়িকতার বিপদকে সামনে নিয়ে এসেছে। কী ঘটছে, তা বুঝতে গেলে আমাদের যেতে হবে ভারতে স্বৈরতান্ত্রিকতার শেকড়ে। এই শেকড় নিহিত আছে একদিকে পুঁজিবাদের নয়া উদারবাদী পর্বে যা রাজনৈতিক ব্যবস্থারই রূপান্তর ঘটাচ্ছে, অন্যদিকে তা নিহিত রয়েছে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতাকে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকে সংহত করার একটি উপকরণ হিসেবে শাসক শ্রেণিগুলির ব্যবহারের মধ্যে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন, বিশ্বব্যাপী লগ্নিপুঁজির আধিপত্য ও নয়া উদারবাদী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার এই পর্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারকেই খর্ব করার এবং মুছে দেবার বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির এই প্রবণতা আরও বাড়ছে এবং গুণগতভাবে একটি নতুন পর্বে প্রবেশ করেছে।

ভারতের স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক শাসনের একটি রূপের বিকাশ ঘটছে। গণতন্ত্রবিরোধী প্রবণতাগুলিকে এবং গণতন্ত্রকে সংকুচিত করার প্রয়াসকে আমাদের দেখতে হবে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক কাঠামো এবং এর বাইরের শক্তিগুলির তরফে এক স্বৈরতান্ত্রিক জবাব হিসেবেই। যা আমাদের বিবেচনায় রাখা উচিত, তা হলো কীভাবে নয়া উদারবাদ বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে খর্ব করে এই ব্যবস্থাকে নতুন চেহারা দিতে চাইছে এবং সাংবিধানিক গণতন্ত্রের একটি স্বৈরতান্ত্রিক সংস্করণ গড়ে তুলতে চাইছে।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্বৈরতান্ত্রিক ধাঁচের শাসনে রূপান্তরের কথা বলতে গিয়ে র‍্যালফ মিলিব্যান্ড তাঁর " দ্য স্টেট ইন ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি" (পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র) বইটিতে ফ্যাসিবাদের তুলনায় কম চরম

বিকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন "যেখানে গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলিকে পুরোপুরি ভেঙে দেবার দরকার পড়ে না, সব ধরনের স্বাধীনতা পুরোপুরি খর্ব করতে হয় না (এবং) নিশ্চিতভাবেই গণতন্ত্রের ধুয়ো তোলা বাদ দিতে হয় না।"

(১)

সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ সংঘটিত করে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ও বিরোধিতাকে দমন করার ফ্যাসিবাদী পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি স্বৈরতন্ত্রের একটি প্রধান উৎস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশ্বায়ন ও নয়া উদারিকরণের প্রভাবে জন্ম নেওয়া বিপজ্জনক পরিচিতি সত্ত্বার রাজনীতি এদের আরও চাঙ্গা করেছে। ভারতে উদারবাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গেই উত্থান হয়েছে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার। আর এই যুগ্ম শক্তিই স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাকে ইন্ধন যোগাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ একটি স্বৈরতান্ত্রিক হিন্দুরাষ্ট্রেই বিশ্বাসী।

১৯৯৮-২০০৪ কেন্দ্রে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের ছয় বছরের শাসনে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনুপ্রবেশের এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নীতির চেহারা বদলে দেবার জন্য আর এস এস'র সংগঠিত প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। এক দশক পর বিজেপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবার সুযোগে আর এস এস এখন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের কাঠামোকে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে গরিষ্ঠতাবাদী লাইনে ঢেলে সাজাতে চায়। স্বৈরতন্ত্রের জমি শুধু রাজনীতির বৃত্তেই তৈরি করা হচ্ছে না, তা হচ্ছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও। গোমাংস খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা, নৈতিক পুলিশগিরি, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে হিন্দুবিরোধী আখ্যা দিয়ে নিন্দা করা, অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর আক্রমণ, তাদের হিন্দুত্ববাদী মূল্যবোধ মেনে চলতে হবে এই আব্দার, শিল্পের ওপর সেন্সরশিপ এবং শিল্পীদের ভীতি প্রদর্শন— এই সব কিছুই সেই স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণের বৈশিষ্ট্য। সর্বোপরি রয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হাতিয়ার,যা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠানিক রূপ পাচ্ছে।

নয়া উদারবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার এই অক্ষই স্বৈরতান্ত্রিকতার সবচেয়ে শক্তিশালী উদ্দীপক। ২০১৪ এর মে মাসে মোদি সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর

থেকে এই স্বৈরতান্ত্রিকতার গতিও বেড়েছে। গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহকে রক্ষা করার লড়াই করতে হবে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিকেই। ধ্রুপদী মার্কসবাদী অবস্থান এটাই যে, বুর্জোয়ারা যখন গণতন্ত্রকে পদদলিত করে তখন শ্রমিকশ্রেণিকেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হয়।

(২)

ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশ এমন এক প্রেক্ষাপটে ঘটেছে যেখানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্যগুলি অসমাপ্ত থেকে গেছে। তাই দেশের সামাজিক গঠনে গণতন্ত্রকে অবরুদ্ধ করার ও গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার প্রবণতা বরাবরই ছিল। কিন্তু লগ্নিপুঁজির আধিপত্যের প্রভাবে বিশ্বজনীন যে পরিবর্তন এসেছে এবং তার জেরে জাতীয় সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত, জাতি রাষ্ট্রগুলির জাতীয় ও জনগণের স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ক্ষয় যা আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির অবনমন, গণতন্ত্রের ফাঁপা হয়ে যাওয়া, রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তরেই প্রতিফলিত। লগ্নিপুঁজির দাবির কাছে নতিস্বীকার করতে শাসকশ্রেণির আন্তরিক আগ্রহ এবং অর্থনীতির সব ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণই রাষ্ট্রের পক্ষে বাজারের শক্তিকে সেবা করার প্রাথমিক উদ্দেশ্য।

জনগণের অধিকারের কথা বলতে গেলে সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের আওতায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা একটি বড় অগ্রগতি ছিল।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্মতি ও অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত জনজমায়েতের হাত ধরে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বৈধতা ও স্বীকৃতি পেয়েছিল। রাজনৈতিক দলগুলিকে তাদের কর্মসূচি ও রাজনৈতিক অবস্থান স্থির করার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই জনগণের গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাগুলোকে মনে রাখতে হচ্ছিল। দেশের অভ্যন্তরে নয়া উদারিকরণ ও লগ্নিপুঁজির প্রভাবে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি এখন ক্রমেই সমপ্রকৃতির হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক দলগুলি যা প্রচার করে এবং বাস্তবে যা করে, তার মধ্যে ফারাক বেড়েই চলেছে। নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো, সরকার বদলাতে পারে

কিন্তু " সংস্কার" প্রক্রিয়া অবশ্যই অব্যাহত থাকতে হবে। দুই দশকের বেশি সময় ধরে এই বোঝাপড়াই চালু রয়েছে। ১৯৯১ সালে নরসীমা রাও সরকার নয়া উদারিকরণের নীতি চালু করার পর থেকে একের পর থেকে সরকারগুলি যে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোটের হোক, বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের হোক বা অকংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ জোটের (সংযুক্ত মোর্চা) হোক— তাদের অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নে অদ্ভুত সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা দেখিয়েছে।

লগ্নিপুঁজির স্বার্থরক্ষা করা এবং পুঁজির প্রবাহ ও বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাই ক্ষমতাসীন যে কোন সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আর্থিক ক্ষেত্রের উদারিকরণ, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের সংস্থার শেয়ারের বিলগ্নিকরণ এবং মৌলিক পরিষেবার বেসরকারিকরণের মতো লগ্নিপুঁজি ও পুঁজিবাদের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলির সমর্থনে কম বেশি একইরকম ভূমিকা নিয়েছে সব বুর্জোয়া দলই। নয়া উদারবাদ নির্দেশিত বৃহত্তর অর্থনৈতিক নীতিগুলিকে বুর্জোয়া দলগুলি বিনা বাক্যেই গ্রহণ করেছে। আমলাতন্ত্রকে কুক্ষিগত করে এবং কর্পোরেট মিডিয়ার সমর্থনে আরও মজবুত হয়েছে নয়া উদারবাদী ব্যবস্থা।

নয়া উদারবাদী নীতি সম্পর্কে রাজনৈতিক ঐকমত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির নিজেদের ভূমিকা ও চরিত্রের পরিবর্তন। উন্নততর জীবন, খাদ্য, আবাসন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও মৌলিক পরিষেবার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষার জবাব দেবার বাধ্যবাধকতায় এদের নির্বাচনী ইস্তেহার এবং প্রতিশ্রুতি এক বিচিত্র দু'মুখো চেহারা নেয়। একদিকে এই বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলি তাদের অর্থনৈতিক নীতিতে নয়া উদারবাদী অভিমুখ অনুসরণ করে অন্যদিকে এরা জনগণের চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতিশ্রুতিও দেয়।

রাজ্য সরকারে নির্বাচিত হলে একটি বুর্জোয়া পার্টিকে কিছু সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিতেই হয়, এবং জনগণের চাহিদা পূরণ করার ধোঁকা বজায় রাখতে কিছু ডোলও দিতে হয়। একই সঙ্গে বৃহৎ পুঁজিপতি ও গ্রামীণ ধনীদের পুঁজি একত্রিত করতে অবাধ স্বাধীনতাও দেওয়া হয়। অন্যদিকে বৃহৎ

ব্যবসা- শাসক রাজনৈতিক- আমলাদের চক্র এটাও নিশ্চিত করে যাতে রাজনৈতিক শাসকরাও এই লাভের কিছু অংশ পায়।

বৃত্তি হিসেবে রাজনীতিকে ক্রমেই আরও বেশি করে এক ধরনের ব্যবসা হিসেবে দেখা হচ্ছে— এবং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত লোকেরা নিজেরাই রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছে। ব্যবসা ও রাজনীতির এই পরস্পর জড়িয়ে যাওয়া একেবারে স্থানীয় সংস্থা থেকে শুরু করে সংসদ পর্যন্ত প্রসারিত। জেলার স্থানীয় সংস্থা, বিধানসভা এবং সংসদে যারা নির্বাচিত হচ্ছেন, তাদের মধ্যে ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গ্রামীণ ধনী, মদ ব্যবসায়ী, ঠিকেদার এবং বড় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব বুর্জোয়া দলগুলির সমস্ত স্তরেই উল্লেখযোগ্য। এর ফলে বুর্জোয়া দলগুলির গঠন এবং তাদের শ্রেণিস্বার্থেরও পরিবর্তন ঘটেছে। বিজেপি এবং কংগ্রেসই প্রধানত বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি হলেও বৃহৎ বুর্জোয়াদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আঞ্চলিক ও রাজ্যস্তরে আঞ্চলিক দলগুলিকে সমর্থন ও ব্যবহার করে। নয়া উদারবাদী জমানায় ঘটা এইসব পরিবর্তনের ফলে বুর্জোয়া দলগুলির এই সমপ্রকৃতির হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় দ্রুতি এসেছে এবং এসব পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে শাসকশ্রেণির এই শ্রেণিগত ঐকমত্যই প্রতিফলিত যে, নয়া উদারবাদী পথ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই।

জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি হিসেবে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ধীরে ধীরে ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে। অধিকাংশ বুর্জোয়া দলে আন্তঃপার্টি গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি তাদের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রকে লঘু করছে। বহু দলই পরিবার পরিচালিত সংস্থায় পরিণত হচ্ছে, যার মধ্যে সার্বিকভাবে রাজনীতির ব্যবসায় পরিণত হবার প্রবণতাই প্রতিফলিত। দলের নেতারা তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের সুযোগে অর্জিত বিষয় সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখতে ও উত্তরাধিকার হিসেবে পরিবারের লোকেদের দিয়ে যাবার জন্য তাদেরই রাজনৈতিক নেতৃত্বে উত্তরাধিকারী হিসেবে নিয়োগ করেন বা গড়ে তোলেন।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবক্ষয় সংসদীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও প্রতিফলিত। নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার পরিপোষিত সর্বব্যাপী উচ্চস্তরে দুর্নীতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলেই আঘাত করে। সরকারি নীতি প্রণয়নের প্রক্রিয়াকে বেসরকারি স্বার্থের

কাছে লঘু করেছে দুর্নীতি। নয়া উদারবাদী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বেশি বেশি সংখ্যায় সবধরনের ব্যবসায়ী ও উদ্যোগপতি সাংসদ ও বিধায়ক হচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারে বহু মন্ত্রী ব্যবসায়ী -রাজনৈতিক ছিলেন, এবং এই যোগসাজস থেকেই স্বার্থের সংঘাত এবং দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের জন্ম।

অর্থনীতি ও নীতি প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি সংসদের আওতার বাইরে। আন্তর্জাতিক চুক্তি ও সমঝোতা সংসদে অনুমোদন করাতে হয় না। সরকার চাইলেই চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের সার্বভৌমত্বের খানিকটা বিলিয়ে দিতে পারে এবং সংসদের এই বিষয়ে কিছু বলার থাকে না। ডাব্লিউ টি ও সমঝোতা, ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি, ভারত মার্কিন প্রতিরক্ষা অবকাঠামো সমঝোতা—সবই সই হয়েছে সংসদীয় অনুমোদন ছাড়াই। মাল্টি ব্র্যান্ড খুচরো ব্যবসাকে বিদেশি পুঁজির জন্য খুলে দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তও সংসদীয় অনুমোদন ছাড়াই কার্যনির্বাহীই নিয়েছে। সংসদের গুরুত্ব কমেছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭২ এর মধ্যে লোকসভা গড়ে বছরে ১২০ দিন কাজ করেছে। ১৯৯১- ২০১০ এর মধ্যে বছরে এই সংখ্যা কমে ৭০ হয়েছে। আর এই সংখ্যার কমে আসা শুধু সংসদে কাজে ব্যাঘাত ঘটার জন্য হয়নি, বরং কার্যনির্বাহী সচেতনভাবে সংসদকে খর্ব করার চেষ্টা করেছে। অর্ডিন্যান্স জারির ক্রমবর্ধমান প্রবণতা এই খর্ব করা চেষ্টারই একটি উদাহরণ।

গণতন্ত্রের ফাঁপা হওয়া এবং রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচিগত অন্তঃসারশূন্যতা নয়া উদারবাদের পর্বে পশ্চিম ইউরোপে দেখা গেছে। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্র এবং দলীয় ব্যবস্থাতেও এই ধরনের কিছু প্রবণতা দৃশ্যমান হয়েছে।

(৩)

নয়া উদারবাদী প্রক্রিয়া থেকে জন্ম নেওয়া স্বৈরতান্ত্রিক চাপের প্রতিফলন ঘটেছে সংবিধানকে সংশোধন করে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের দাবির মধ্যে। মূল জোর পড়ছে "স্থায়িত্ব' ও 'শক্তিশালী সরকার' এর ওপর। ১৯৯০-র দশকেই অনেক জোরালোভাবে ওঠে রাষ্ট্রপতিকেন্দ্রিক

ধাঁচের সরকারের দাবি; এই প্রস্তাবকে বিজেপি সমর্থন করে এবং এর পক্ষে সবচেয়ে জোরালো সওয়াল করেন লালকৃষ্ণ আদবানি।

দশম লোকসভার স্পীকার শিবরাজ পাতিল, ব্যবস্থার পর্যালোচনার ওপর একটি আলোচনা-পত্র প্রচার করেন। এতে যেসব পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ছিল ' লোকসভার জন্য পাঁচ বছরের স্থায়ী মেয়াদ, যাতে মধ্যবর্তী পর্বে একে ভেঙ্গে দেয়া যাবে না, বিভিন্ন দলের জোট গড়ে দুই- তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকার গঠন, যা সম্ভব না হলে রাষ্ট্রপতি সংসদ বহির্ভূত ব্যক্তিদের নিয়ে বা " সাংবিধানিক কর্তৃপক্ষে"র সহায়তায় সরকার গঠন করবেন। এসব প্রস্তাবের মূল লক্ষ্যই ছিল রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে গঠিত সংসদীয় ব্যবস্থাকে খর্ব করা। রাষ্ট্রপতি ধাঁচের সরকারের মূল কথাই হল— একটি আরও বেশি স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামো, যার মোদ্দা কথা হবে রাষ্ট্রপতির হাতে কার্যনির্বাহী ক্ষমতা।

সাংবিধানিক পন্থা অবলম্বন করে সংসদীয় ব্যবস্থাকে বদলে দেবার চেষ্টা এক দশক ধরে চললেও তাতে তেমন সাফল্য আসেনি। নরেন্দ্র মোদির মতো একজন রাষ্ট্রপতির হাতে যদি কার্যনির্বাহীর ক্ষমতা থাকতো, তবে আর এস এস- বিজেপি জোটের জন্য তা আদর্শ হতো। কিন্তু সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীর শেকড় ও বিরাট বৈচিত্র্যকে জায়গা করে দেবার এই ব্যবস্থার ক্ষমতা একটি স্বৈরতান্ত্রিক রূপান্তরের উদ্যোগকে প্রতিহত করেছে। স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাংবিধানিক কার্যক্রমের প্রয়াস আপাতত পরিত্যক্ত। তার বদলে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ব্যবস্থাসহ বহু ক্ষেত্রে স্বৈরতান্ত্রিক পন্থা পদ্ধতি চাপিয়ে দেবার ক্রমবর্ধমান বহুমুখী প্রচেষ্টা।

'জাতীয় নিরাপত্তা রাষ্ট্রে'র একটি রূপও আকার নিচ্ছে। ১৯৮০'র দশকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রসারও এই ধরনের একটি শক্তিশালী জাতীয় নিরাপত্তা রাষ্ট্রকে বৈধতা দিয়েছে। সংবিধানেই (অনুচ্ছেদ-২২) রয়েছে প্রতিরোধমূলক আটকেরও সংস্থান। সংবিধান কার্যকর হবার পরেই এই বিষয়ে আইন পাস হয়েছে। প্রতিরোধমূলক আটক আইন (১৯৫০) এর পর থেকে এন এস এ- টাডা, পোটা সমেত একগুচ্ছ আইন পাস হয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক আটকের ব্যবস্থা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ফৌজদারি আইনে দেওয়া রক্ষাকবচ ও

আইনি অধিকারও খর্ব করা হয়েছে। এই ধারায় সর্বশেষ আইন হল ২০০৮ এর বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউ এ পি এ)। এসব আইনকে ব্যবহার করা হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করতে। হাজার হাজার লোককে এইসব আইনে আটক করা হয়েছে, এদের মধ্যে খুব অল্প লোকেরই বিচার হয়েছে। তারও কম সংখ্যক আদালতে দোষী প্রমাণিত হয়েছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির রাষ্ট্রদ্রোহিতা সংক্রান্ত ধারাগুলি (রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা) প্রায়শই ব্যবহার হয় সেই লোকেদের গ্রেপ্তার করতে যারা রাষ্ট্রের সেইসব নীতি ও প্রকল্পের বিরোধিতা করেন, যেগুলি জনগণের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন করে।

স্বৈরতান্ত্রিক আইনগুলির লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন মুসলিম যুবকরা ও আদিবাসী জনগণ। শত শত মুসলিম যুবককে সন্ত্রাসবাদী হামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, কিংবা দীর্ঘদিন আটক করে রাখা হয়েছে, তারপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মাওবাদী সন্ত্রাস মোকাবিলার নামে আদিবাসীদের হেফাজতে নেয়া হয়েছে এবং এইসব আইনে আটক করে রাখা হয়েছে। স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব এতটাই তীব্র হয়েছে যে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী জনগণের বিরুদ্ধে ভূমিকা নিচ্ছে আইন বা শাস্তির ভয় ছাড়াই। সন্ত্রাস ও মাওবাদী হিংসা মোকাবিলার নামে ভুয়ো এনকাউন্টার, বেআইনি আটক ও পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন অতি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একাংশ ও জম্মু কাশ্মীরে বলবৎ থাকা আফস্পা সশস্ত্র বাহিনীকে ফৌজদারি দন্ডবিধির এক্তিয়ার বহির্ভূত ক্ষমতা দিয়েছে। তাদের শাস্তির ভয়ের উর্ধ্বে উঠে ভূমিকা নেবার ক্ষমতা দিয়েছে, যার ফলে বহু নিরীহ অসামরিক মানুষ মারা গেছেন।

নয়া উদারবাদী জমানার অন্যতম অগ্রাধিকার হল 'শ্রম আইনের নমনীয়তার' দাবি। এরই অনুসঙ্গ হিসেবে এসেছে ট্রেড ইউনিয়নকে দুর্বল করার দাবি। মোদি সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক চাপেরই অঙ্গ হিসেবে আনা হয়েছে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে শ্রম আইন সংশোধনের প্রস্তাব। রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার ইতোমধ্যেই এসব আইন পরিবর্তন করেছে।

গণপ্রতিবাদ ও রাজনৈতিক জনসমাবেশের সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। জমায়েত, প্রতিবাদ এবং রাজনৈতিক প্রচারের ওপর নয়া উদারবাদী পর্ব শুরু হবার পর বিধিনিষেধ বেড়ে চলেছে। যেখানে কার্যনির্বাহী বা প্রশাসন হস্তক্ষেপ করছে না, সেখানে জনগণের অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ চাপাতে সক্রিয় উচ্চতর বিচারবিভাগ। ১৯৯৭ সালে কেরালা হাইকোর্ট বন্‌ধকে বেআইনি ঘোষণা করে, সুপ্রিমকোর্ট এই রায়কে বৈধতা দেয়। এক বছর পর হরতাল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। আদালত এমন বহু প্রকাশ্য স্থানে জমায়েত ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছে যা জনজমায়েতের চিরাচরিত জায়গা ছিল। ধর্মঘট ও কর্মস্থলের কাছে জমায়েতের ওপর অবশ্যম্ভাবীভাবেই নিষেধাজ্ঞা জারি করে আদালত।

এই সব কিছুর সার্বিক ফলাফল হল, গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হওয়া, নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষয় এবং গণপ্রতিবাদের স্থান সংকুচিত হয়ে আসা। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে আইনসংগতভাবে ন্যস্ত দমনমূলক ক্ষমতারও অতিরিক্ত এইসব ব্যবস্থাপনা। রাষ্ট্রের সাধারণ নিপীড়ন যন্ত্রের আওতার বাইরে থাকা এসব দমনমূলক ব্যবস্থাকেও স্বৈরতান্ত্রিকতা বৈধতা দেয়।

(৪)

সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামকে কী করে নয়া উদারবাদী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে, এটাই হচ্ছে জরুরি বিষয়। ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র অর্থাৎ সংসদীয় ব্যবস্থার অবক্ষয় দারুনভাবেই ঘটছে। নির্বাচনী ব্যবস্থায় বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের হাত ধরে নয়া উদারবাদ বামপন্থার জন্য গণতান্ত্রিক পরিসরকে রুদ্ধ করছে।

তবে এই সিদ্ধান্তে আসা ভুল হবে যে সংসদীয় নির্বাচনী ব্যবস্থার সব গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাই শেষ হয়ে গেছে। আনুষ্ঠানিক সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যেও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম জারি রাখতে হবে। অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারির পর ১৯৭৭ এর নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী রাজত্বের পরাজয় একথাই মনে করিয়ে দেয় যে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের অধিকারের ওপর যতই বিধিনিষেধ থাকুক, জনগণ সেসব অধিকার সহজে ছেড়ে দেবেন না। কিন্তু

গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে নিছক সংসদীয় ব্যবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে সীমিত রাখা একটি বড় ধরনের ভুল এবং শোধনবাদী ভ্রান্তি হবে, বিশেষ করে সেই সময়ে যখন আনুষ্ঠানিক সংসদীয় গণতন্ত্র ফাঁপা হয়ে পড়ছে এবং জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ছে।

নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রমজীবী জনগণকে একটি বিকল্প কর্মসূচির পাশে সমবেত করা— অর্থাৎ নয়া উদারবাদী পথের থেকে সম্পূর্ণ সরে আসাই সংগ্রামের একটি বড় জায়গা। এই পথেই স্বৈরতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং তাকে পরাস্ত করা সম্ভব, কারণ নয়া উদারবাদই স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি ও মতাদর্শের জরুরি উৎস হিসেবে কাজ করে। স্বৈরতান্ত্রিকতার অন্য উৎস, অর্থাৎ মূলত হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের জীবিকা ও অধিকার রক্ষার সংগ্রামের সমন্বয় ঘটানো দরকার। তীব্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং বেকারি সাম্প্রদায়িকতার জন্য উর্বর জমি যোগায়। বিভেদকামী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জনপ্রিয় আন্দোলন এগিয়ে নিতে গেলে জনগণের মূল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির জবাব দিতেই হবে।

বিজেপি' কে বিচ্ছিন্ন ও পরাজিত করতে নির্বাচনী লড়াই জরুরি হলেও তা সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলায় অপর্যাপ্ত, কারণ সাম্প্রদায়িক শক্তি মতাদর্শগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে সক্রিয়। এইসব ক্ষেত্রেই আরও দৃঢ়মনস্ক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। নয়া উদারবাদী ব্যবস্থা ও হিন্দুত্বের আদর্শ সামাজিকভাবে নিপীড়িত সমস্ত অংশের স্বার্থের বিরোধী। দলিত, আদিবাসী, মহিলা ও সংখ্যালঘুদের অধিকার আক্রান্ত। তাদের সমস্যার অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে। শ্রেণিভিত্তিক সংগ্রাম ও সামাজিক সংগ্রামের মধ্য একটি জীবন্ত সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে হবে।

নয়া উদারবাদী সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একমাত্র ধারাবাহিক লড়াইয়ের শক্তি বামপন্থীরাই। তাই মোদি- কায়দায় স্বৈরতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক জনসমাবেশ ঘটাতেও বামপন্থীদেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

ফেক ইন ইন্ডিয়া : বি জে পি'র ছদ্ম জাতীয়তাবাদ

কিরণ

আর এস এস নিজেদের 'জাতীয়তাবাদী' সংগঠন হিসেবে দেখাতে প্রচুর কসরৎ করে। বস্তুত যাদের এই উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রচারের লক্ষ্য হল এটা দেখানো যে এক্ষেত্রে তারা অন্যদের চাইতে কতটা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এই 'জাতীয়তাবাদ' এর সারবস্তু কী? বিশেষজ্ঞরা এটা দেখিয়ে দিয়েছেন যে স্বাধীনতার সংগ্রামে আর এস এস'র কোন ভূমিকাই ছিল না। যা কম আলোচিত হয়েছে এবং যেদিকে আলোকপাত করা দরকার, তা হল, অর্থনৈতিক নীতির অঙ্গনেও সংঘ পরিবারের ভূমিকা আদৌ জাতীয়তাবাদী নয়।

১৯৯১ থেকে পরপর সরকারগুলি একটি আগ্রাসী নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক নীতির এজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, যার একটি মূল স্তম্ভ হল বিদেশি পণ্য ও পুঁজির জন্য ভারতের বাজার ও শিল্পের দরজা খুলে দেওয়া। একাজ করা হয়েছে মূলত: একটি সময়পর্ব ধরে কাস্টম শুল্কের নাটকীয় হ্রাস ঘটিয়ে আমদানির সুবিধা করে দিয়ে এবং সেই সঙ্গে সেই সব ক্ষেত্রের সংখ্যা বাড়িয়ে যেখানে বিদেশি পুঁজি লগ্নি করা যাবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরিমাণ বিদেশি পুঁজি লগ্নি করা যাবে যার সীমা ধারাবাহিকভাবে বাড়িয়ে। এই ২৪ বছর ও কয়েক মাসের সময় পর্বে প্রায় ৮ বছর বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিল, প্রথমে ১৯৯৮- ২০০৪ পর্যন্ত অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে। দুই মেয়াদেই নয়া উদারবাদী এজেন্ডাকে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে বিজেপি'র উৎসাহ কোনভাবেই কংগ্রেসের চেয়ে কম ছিল না।

দুয়ের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থাকে, তা হল কিছু সময় অন্তর অন্তর "স্বদেশি'র ধুয়ো তোলা, যা আসলে জনগণের অভিমতের প্রতি মৃদু সম্মতি ও এই বাস্তবতার স্বীকৃতি যে সাধারণভাবে মানুষ সংস্কারের প্রতি উচ্ছ্বসিত নন। তার চেয়ে বেশি এটা আর কিছুই নয়। 'স্বদেশি'র প্রশ্নে সংঘ পরিবারের দ্বিচারিতা বোঝা জরুরি। ১৯৯১ সালে পি ভি নরসীমা রাও'র তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের

শুরু করা অর্থনৈতিক সংস্কারের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষকে কব্জা করার লক্ষ্যেই আর এস এস স্বদেশি জাগরণ মঞ্চ গঠন করেছিল। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের মাধ্যমে আর এস এস অর্থনৈতিক নীতির বৃত্তে নিজেকে একটি 'জাতীয়তাবাদী' শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছে। ফল দিয়েই যেমন গাছের পরিচয় হয়, তেমনি বাস্তবে বাজপেয়ী সরকার এবং মোদি সরকার দুইই সন্দেহাতীতভাবে একথা প্রমাণ করেছে যে আর এস এস-এর রাজনৈতিক শাখা বিজেপি স্বদেশি বা জাতীয়তাবাদী এজেন্ডাকে শুধু মুখে সমর্থন করেই পরিতৃপ্ত।

মোদির বিক্রিবাটা

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদির দুই ডজনের বেশি বিদেশ সফরের বৈশিষ্ট্য হল ভারতে বিনিয়োগ করার জন্য বিশ্বের কাছে আবেদন নিবেদন এবং সরকার যে বিদেশি সংস্থাগুলির জন্য ভারতে ব্যবসা করার পথ সুগম করে দেবে সে বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করা।

সম্প্রতি যে ১৫টি ক্ষেত্রকে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল তা এই সরকারের বিদেশি বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করার মরিয়া মনোভাবেরই সর্বশেষ উদাহরণ। বিদেশি পুঁজির জন্য ভারতের দরজা খুলে দেবার দৌড়ে প্রতিরক্ষা ও রেলের মতো ক্ষেত্রও বাদ পড়েনি যদিও তাদের স্ট্র্যাটেজিক গুরুত্ব প্রশ্নাতীত।

নিজের সদিচ্ছা প্রমাণে ব্যস্ত মোদি সরকার বেশ কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে যার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক পুঁজিকে এই বিষয়ে আশস্ত করা যে সরকার আসলে ভারতে তাদের ব্যবসার পথ প্রশস্ত করতেই কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৪ তে মোদির মার্কিন সফরের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং নরেন্দ্র মোদির যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, " নেতৃবৃন্দ বাণিজ্য নীতি ফোরামের অঙ্গ হিসেবে একটি উচ্চস্তরের মেধা সম্পদ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করতে দায়বদ্ধ যারা যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কারিগরি স্তরের সিদ্ধান্ত নেবার জন্য প্রতিবছর বৈঠক করবে।" এই বিবৃতিতেই উন্নয়নশীল দুনিয়ায় সতর্ক সংকেত পৌছে যায়। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের মঞ্চকে আরও কঠোর পেটেন্ট আইন

চাপিয়ে দেবার জন্য ব্যবহার করার বিষয়ে সুপরিচিত, যেসব আইন জনগণের জন্য আরও দামী ওষুধের বিনিময়ে ওষুধ নির্মাতা বহুজাতিকদের সুবিধা করে দেবে। বহুজাতিক একটি বিষয়কে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার অঙ্গ হিসেবে গণ্য করতে রাজি হয়ে মোদি সরকার এই সংকেতই দিয়েছে যে, তারা বৃহৎ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলির স্বার্থরক্ষায় ইচ্ছুক। সরকার ভারতের জন্য নতুন মেধা সম্পদ নীতির খসড়া রচনার জন্য যে মেধা সম্পদ থিংক ট্যাংক গঠন করেছেন, তাতে সেই আইনজীবীদেরই ভিড় যারা ভারতীয় আদালতে বহুমাত্রিক কর্পোরেশনগুলির হয়ে সওয়াল করেছেন। অথচ মেধা সম্পদ ইস্যুতে যারা কাজ করছেন সেই নাগরিক সমাজ, গোষ্ঠী বা শিক্ষাবিদদের পুরোপুরি বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে এই খসড়া মেধা সম্পদ নীতি তার আই পি প্রোটেকশনের ধারনার প্রতি অতি উৎসাহের জন্য উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। (আই পি প্রোটেকশন পেটেন্ট আইনের সেই দিক যাতে উৎপাদকের লাভ হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনগণ)। এই খসড়া নীতিতে আই পি প্রোটেকশনকেই ভারতে উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে নিশ্চিত করার একমাত্র পথ বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে।

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য মোদি সরকারের আরেকটি বড় পদক্ষেপ হল 'নমনীয় শ্রম আইন '। এর অর্থ কী তা রাজস্থানের বিজেপি সরকার সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। বেশ কিছু প্রতিবেদনের মতে, রাজস্থানের বিজেপি সরকারের এই শ্রমিক বিরোধী সংস্কারগুলি আসলে কেন্দ্রের জন্য এই ক্ষেত্রে নীল নক্শা হিসেবে কাজ করেছে। সবচেয়ে ক্ষতিকারক পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে ৩০০-র কম কর্মচারী আছে এমন শিল্প ইউনিটকে ইচ্ছেমতো লোক ছাঁটাই করার সুযোগ করে দেওয়া। অবশ্য ছাঁটাইয়ের জন্য উচ্চ ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিয়ে এই তেতো বড়িকে মিষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, ২০০৯ সালে ৮৪ শতাংশ ভারতীয় ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটেই কর্মীর সংখ্যা ৫০ বা তার কম। ৩০০-র বেশি কর্মী কাজ করেন এমন ইউনিটের সংখ্যা হবে গোটা শ্রমশক্তির একেবারেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। সংক্ষেপে এই ধরণের সংস্কারের অর্থ হবে শ্রমিকদের ওপর এক বিরাট আঘাত এবং পুঁজির জন্য বিশাল সুবিধার ব্যবস্থা। তারপরও দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের

স্বার্থের পরিপন্থী এই নীতি সরকার এগিয়ে নিচ্ছে। একাজ করা হচ্ছে সরকারের বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টার অঙ্গ হিসেবে।

অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি তার প্রথম বাজেট ভাষণেই বিদেশি পুঁজি সম্পর্কে নতুন সরকারের মনোভাব স্পষ্ট করে দেন। তিনি বলেন, " বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ সম্পদের একটি অতিরিক্ত উৎস হবে, যা অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করবে"। এফ ডি আই' কে বাছাই করেই উৎসাহিত করা হবে বলে দাবি করলেও তিনি প্রতিরক্ষা উৎপাদন ও বিমা ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগের সীমা ২৬ থেকে ৪৯ শতাংশে বাড়িয়ে দেবার ঘোষণা দিয়ে দেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে এফ ডি আই'র ঢোকার পথ উদারভাবে খুলে দেবার পদক্ষেপও ঘোষণা করেন জেটলি।

কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে মোদি সরকারের এই সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি নতুন কিছু নয়। ১৯৯১ থেকে বিজেপি এবং কংগ্রেসের সরকারগুলি যা করে এসেছে, এসব তার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদিও সময়ের সঙ্গে এসব নয়া উদারবাদী নীতি অনুসরণের তীব্রতা বেড়েছে। এই সরকারগুলির দ্বারা এসব নীতি অনুসরণের নিট ফল হয়েছে এই যে এখন প্রধান ভারতীয় কোম্পানিগুলির ৩০ শতাংশ শেয়ার আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি বা বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের নিয়ন্ত্রণে। শেয়ার বাজারের ওপর এদের এতটাই নিয়ন্ত্রণ যে বাজারের গতি কোনদিকে যাবে তা এরাই নির্ধারন করে। বাজারের ওঠা নামা নিয়ে আমরা এত মাথা না ঘামালেও মোদ্দা কথা হল, লগ্নিপুঁজির এমন দাপুটে অস্তিত্ব অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। যেহেতু চারিত্রিকভাবেই লগ্নিপুঁজি অস্থির, স্বল্প সময়ের নোটিসেই বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত। তাই এদের হাতে সরকারকে ব্ল্যাকমেল করার ক্ষমতা এসে যায়। কারণ সরকারের কোন পদক্ষেপ এদের কাছে নেতিবাচক মনে হলেই বাজার থেকে দ্রুত পুঁজি বেরিয়ে যায়। যার চাপ পড়ে মুদ্রার বিনিময় মূল্যের ওপর, যার জেরে অর্থনীতি বেসামাল হয়ে পড়ে। সেজন্যই বহু অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে একটি দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে লগ্নিপুঁজিকে সবচেয়ে বড় বিপদ বলে অভিহিত করেছেন। বিজেপি যতই জাতীয়তাবাদী ভড়ং দেখাক, কাজে এরা এমন একটি

পরিস্থিতি তৈরির পক্ষেই অবদান রেখেছে যেখানে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের খোশ মেজাজে রাখা আর্থিক নীতির মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের তুষ্ট রাখার এই নীতি যে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে প্রতিশ্রুতিমতো আশাতীত বিদেশি বিনিয়োগের বর্ষণ ঘটিয়েছে, তাও নয়। ২০১৫ এর মার্চ পর্যন্ত ভারতে মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ৩৬৮.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে বিদেশি কোম্পানিগুলির ভারতে কামানো মুনাফার পুনর্বিনিয়োগও রয়েছে। এর মধ্যে একক সর্ববৃহৎ অংশ, যা মোট বিনিয়োগের প্রায় ছয় ভাগের একভাগ বা ৪৩ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে মূলত ব্যাঙ্কিং, বিমা ও এন বি এফ সি'র মতো আর্থিক পরিষেবাক্ষেত্রেই।

স্বদেশি নিয়ে বাগাড়ম্বরের সম্পূর্ণ বিপরীতে ভারতকে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য খুলে দেবার ক্ষেত্রে এদের সরকারগুলির পেশ করা বাজেটের মাধ্যমে এবং বাজেটের বাইরে নেওয়া নীতিগত সিদ্ধান্ত উভয়তই বিজেপির ভূমিকা যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। আমরা প্রথমে বিশদে দেখবো কীভাবে বিজেপি'র নেতৃত্বাধীন সরকারগুলির প্রতিটি বাজেটে অনুসৃত হয়েছে জাতীয়তাবাদী বাগাড়ম্বরের সঙ্গে কাজে বিদেশি স্বার্থে দেশ বিক্রির ধারা। তারপর চোখ রাখবো সেসব মুখ্য সংস্কারমূলক পদক্ষেপের দিকে, যা এই এজেন্ডাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে।

কিন্তু কেউ এই প্রশ্ন করতেই পারেন, ভারতে বিদেশি পুঁজির বর্ধিত ভূমিকার পক্ষে সওয়ালকারী এজেন্ডাকে জাতীয়তা বিরোধী বলতে হবে কেন? এর উত্তর নিহিত আছে দেশের সার্বভৌমত্বের পক্ষে এই এজেন্ডার ভূমিকা কী এবং জনগণ বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণির ওপর এর কী প্রভাব এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে। যেমনটা আমরা আগেই দেখেছি, লগ্নিপুঁজি থেকে আসা দ্রুত সঞ্চারণশীল অর্থের ক্ষমতা আছে সরকারগুলির সেই সব নীতি গ্রহণের ক্ষমতা লুপ্ত করার যেসব নীতি, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের প্রতিকূল, এমনকি যদি সেসব নীতি জনগণের স্বার্থে নিতান্ত জরুরিও হয়। লগ্নিপুঁজি যা সরকারের এই ধরণের নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্তকে সংকুচিত করেও থাকে।

যেমন, অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে এটাই খুব স্বাভাবিক যে সরকার কল্যাণমূলক কর্মসূচিসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়াবে যাতে চাহিদা বাড়ে এবং যারা এই সংকটে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত তাদের কিছু রিলিফ দেওয়া যায়। কিন্তু এই বিনিয়োগকারীদের বড় প্রিয় সমগ্র আর্থিক শৃঙ্খলার মন্ত্র সরকারগুলিকে এই পদক্ষেপ নিতে দেয় না।

এফ ডি আই'র কথা ধরা যাক। একটি বহুজাতিক সংস্থা ভারতে কি চায়? হয় এরা ভারতের বিপুল জনসংখ্যার সুবাদে বিশাল ভারতীয় বাজারকে ধরতে চায়, নয়তো অন্য বাজারে বিক্রির জন্য উৎপাদনের খরচ কমাতে এখানকার সস্তা শ্রমকে কাজে লাগাতে চায় অথবা দুটোকেই একসঙ্গেই চায়। এরা ভারতের বাজারকে যতটা কব্জা করতে পারে ঠিক সেই পরিমাণেই এরা একজন ভারতীয় উৎপাদককে বাজার থেকে সরিয়ে দেয় যিনি হয়তো একই মাল উৎপাদন করে দেশের ঘরোয়া বাজারে বিক্রি করতেন। এই প্রক্রিয়ায় যে মুনাফা হয়, তা চলে যায় বিদেশি মালিকের হাতে, যা দেশেই থাকতে পারতো। যেহেতু এরা ভারতের সস্তা শ্রমকে কব্জা করতে চায়, তাই ভারতে শ্রম যাতে সস্তা থাকে তাতেই তাদের স্বার্থ নিশ্চিত থাকে। সুতরাং আপনার অর্থনৈতিক নীতিমালার ভিত্তি যদি হয় এফ ডি আইকে আকৃষ্ট করা এবং বিনিয়োগকারীকে খুশি রাখা— যেমনটা মোদি সরকারের ' মেক ইন ইন্ডিয়া' কর্মসূচিতে রয়েছে, তাহলে এটাই স্বাভাবিক যে সেই সরকার এমন কোন কিছুই করতে পারবে না যা বিনিয়োগকারীদের হিসেব মতো শ্রমের দাম বা শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে তার প্রকৃত মজুরি বাড়িয়ে দেয়। সেজন্যই দেখা যায় কীভাবে এম এন রেগার মতো একটি অতি সাধারণ কর্মসংস্থান প্রকল্পকেও সংস্কারপন্থী আলোচকরা " জনপ্রিয়তাবাদী" বলে খারিজ করেন এবং একেই ভারতীয় কৃষিতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির জন্য দায়ী করে একে আটকাবার চেষ্টা হয়। আরও লক্ষ্যণীয় এই সংস্কারকরাই "শ্রম বাজারের অনমনীয়তা" দূর করার জন্য মরিয়া হয়ে সওয়াল করেন। সোজা কথায়,তারা চান মালিকদের হাতে ইচ্ছেমতো শ্রমিকদের ছাঁটাই বা কর্মচ্যুত করার অবাধ ক্ষমতা থাকুক। একজন বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটা জরুরি, কারণ নিরাপত্তাহীন শ্রমশক্তির সংগঠিত হবার এবং উচ্চতর মজুরির জন্য লড়াই করার

সম্ভাবনা কম। আর এই পরিস্থিতিতেই বেকারদের লড়িয়ে দেওয়া যায় তাদের বিরুদ্ধে যাদের কাজ আছে, যদিও একেবারে সংক্ষিপ্ত নোটিসেই তারা কাজ হারাতে পারেন।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারগুলির বাজেট

'জাতীয়তাবাদের' বাগাড়ম্বর করার পাশাপাশি বিজেপি কীভাবে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের পদসেবা করে গেছে তা ১৯৯৮ সালে এই দলটি প্রথম ক্ষমতায় আসার পর থেকে এদের একের পর এক অর্থমন্ত্রীদের বাজেট ভাষণ পড়লেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯৯৮ সালে যশবন্ত সিন্‌হা তাঁর প্রথম বাজেট ভাষণেই এটা স্পষ্ট করে দেন যে এফ ডি আই সহ বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহ দেওয়াই তাঁর একটি "উচ্চ অগ্রাধিকার" হবে। সেই সঙ্গেই তিনি ভারতের বাজারে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক লগ্নিকারকদের আরও বেশি ঢোকার সুযোগ করে দেন। ১৯৯৯ সালে সিন্‌হা ঘোষণা করেন, ফার্মামিউটিক্যালসের ক্ষেত্রে সরাসরি ৭৪ শতাংশ পর্যন্ত এফ ডি আই'র অনুমতি দেওয়া হবে। যদিও তিনি এটা স্বীকার করেছিলেন যে, এইক্ষেত্রে ভারত তুলনামূলকভাবে এগিয়ে রয়েছে। (অর্থাৎ ওষুধ শিল্প ভারতে আগে থেকেই সমৃদ্ধ)। তিনি এফ ডি আই'র জন্য সরাসরি অনুমোদিত এলাকার সংখ্যা পর পর বাড়িয়ে গেলেন এবং খুব দ্রুত সেসবে সম্মতিও দিয়ে গেলেন। ২০০০ সালে সিন্‌হা বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ বা এফ আই আই এর সীমা বাড়িয়ে দিলেন এবং ফরেন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডগুলির ভারতে বিনিয়োগের পথ সুগম করে দিলেন। তিনি সর্বোচ্চ কাস্টম শুল্ক ৪০ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশ করে দিলেন ফলে বিদেশ থেকে আমদানির সুযোগ বেড়ে গেল।

২০০১ সালে সিন্‌হা বিভিন্ন কোম্পানিতে বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের সীমা ৪০ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ শতাংশ করে দেন এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক পরিসেবায় এফ ডি আই' কে সরাসরি পথ করে দেন। ২০০২ সালে যশবন্ত সিন্‌হাই ঘোষণা করেন, কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়া ক্ষেত্রভিত্তিক এফ ডি আই'র যে সীমা আছে এফ আই আই বা বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ

তার ওপর নির্ভর করবে না এবং সমস্ত শেয়ার বাজারের সব ডেরিভেটিভসে এফ আই আই' কে অংশ নেবার অনুমতি দিয়ে দেন।

সেই বাজেটেই সিন্‌হা সিদ্ধান্ত নেন ভারতীয় ও বিদেশি সংস্থাগুলির কর্পোরেট ট্যাক্সের হারে যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করা দরকার। তাই তিনি বিদেশি সংস্থাগুলির প্রদেয় কর্পোরেট করের হার ৪৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪০ শতাংশ করে দেন। ২০০৩ সালে যশবন্ত সিং ঘোষণা করেন ব্যাংকিং কোম্পানিগুলিতে সে সময় এফ ডি আই'র যে ৪৯ শতাংশ উর্ধ্বসীমা ছিল তা বাড়িয়ে 'অন্তত ৭৪ শতাংশ' পর্যন্ত অনুমোদিত হবে যাতে বিদেশি ব্যাংকের সহযোগী সংস্থা খুলতে এবং বেসরকারি ব্যাংকে বিনিয়োগ করতে সুবিধা হয়।

বাজেট বহির্ভূত বিক্রি

বিদেশি বৃহৎ ব্যবসার স্বার্থরক্ষায় এবং ভারতের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করতে বাজেটের বাইরেও বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারগুলি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

১৯৯৯ সালের টেলিকম নীতিতে টেলিকম অপারেটরদের সুযোগ করে দেওয়া হয়— ১৯৯৪ এর টেলিকম নীতিতে তাদের দরপত্রে দেওয়া লাইসেন্স ফি না দিয়ে, তার বদলে তাদের আয়ের একাংশ দিয়ে বিষয়টির নিষ্পত্তি করে নিতে। এই নীতিতেই বেনজিরভাবে দ্রুত প্রসারমাণ টেলিকম ক্ষেত্রকে বিদেশি কোম্পানিগুলির জন্য খুলে দেওয়া হয়। এইক্ষেত্রে বেসিক পরিসেবার ক্ষেত্রে ৪৯ শতাংশ, লং ডিসট্যান্স নেটওয়ার্ক প্রোভাইডারদের এবং গেটওয়ে সমন্বিত ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের ৭৪ শতাংশ এবং গেটওয়েহীন ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের জন্য ১০০ শতাংশ এফ ডি আই'র সুযোগ করে দেওয়া হয়। এর ফলে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান টেলিকম মার্কেটে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে যায় বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলি।

আবার ১৯৯৯ সালের বাজপেয়ী সরকার বিমা ক্ষেত্রকে দেশি ও বিদেশি বেসরকারি ক্ষেত্রের জন্য খুলে দেয়। এর ফলে ২০১৩-১৪তে এসে বাজারের প্রায় এক চতুর্থাংশ জীবন বিমা এবং জীবন বিমা বহির্ভূত বিমার অর্ধাংশ

বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলির দখলে চলে যায়, যাদের অধিকাংশই বিদেশি বিমা কোম্পানিগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা করছে। বিদেশি বিমা কোম্পানিগুলির" "বিশ্বস্তরের সেরা কাজকর্মের কায়দা" এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের দক্ষতা বিমা পরিসেবার উন্নতি ঘটাচ্ছে বলে যুক্তি দেখানো হয়, সে দাবিকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছে ইনসুরেন্স রেগুলেশন অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট অথরিটির দেওয়া তথ্য। এতে দেখা গেছে, এল আই সি'র দাবি নিষ্পত্তির হার ৯৮ শতাংশ, যেখানে বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলির ক্ষেত্রে এই হার ৮৮ শতাংশ, অর্থাৎ ১০ শতাংশ বেশি। এই প্রমাণ সত্ত্বেও মোদি সরকার বিমা ক্ষেত্রে এফ ডি আই'র বিধিনিষেধ আরও শিথিল করেছে। টেলিকম এবং বিমার পাশাপাশি সড়ক এবং অসামরিক বিমান পরিবহনেও ভারতে বিদেশি পুঁজির প্রবেশের পথ করে দিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারই।

মারুতি উদ্যোগ লিমিটেডের ঘটনাই দেখিয়ে দেয় যে একটি বৃহৎ লাভজনক সংস্থার নিয়ন্ত্রণ বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে তুলে দিতেও বিজেপি'র কোন আপত্তি নেই। মারুতি উদ্যোগ লিমিটেড জাপানের সুজুকি মোটর কর্পোরেশন এবং ভারত সরকারের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছিল, দুপক্ষের হাতেই ছিল সমান শেয়ার। কিন্তু ২০০২-র মে মাসে এন ডি এ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে সুজুকিকে মারুতির ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ নিতে দেওয়া হবে। বদলে তাদের দিতে হবে মাত্র ১,০০০ কোটি টাকার যৎকিঞ্চিত 'কন্ট্রোল প্রিমিয়াম'।

সিদ্ধান্তটি বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের না হলেও জালিয়াত মার্কিন বিপুলবপু বিদ্যুৎ কোম্পানি এনরণের ঘটনা, অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ নিয়ে গেরুয়া ব্রিগেডের দাবির চূড়ান্ত শঠতার আরেকটি নির্দশন। ১৯৯০-র গোড়ায় এনরণ মহারাষ্ট্রে যে দাভোল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে তা এক চূড়ান্ত পাইয়ে দেওয়ার সমঝোতা বলে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল। অভিযোগ ছিল দিল্লি ও মুম্বাইর সরকার ঐ বিদেশি সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের দারুণ সুবিধা করে দেয়। এতে দারুণ ক্ষতি হয় মহারাষ্ট্র রাজ্য বিদ্যুৎ বোর্ডের। এরা বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে বিদ্যুতের প্রতি ইউনিটে ৫ টাকা করে দিচ্ছিল। অথচ এরা ভোক্তাদের কাছ থেকে ইউনিট পিছু দুই টাকারও কম আদায় করছিল। এই

প্রকল্পের প্রাথমিক চুক্তি যখন সই হয় তখন মহারাষ্ট্রে বিরোধী আসনে বসে বিজেপি এবং শিবসেনা এই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে তর্জন গর্জন করেছিল এবং ক্ষমতায় এলে এনরণকে আরব সাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিল। ১৯৯৫ সালে সেনা-বিজেপি জোট মহারাষ্ট্রে ক্ষমতায় এসে দাভোল পাওয়ার কর্পোরেশনের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে। অবশ্য খুব শিগগিরই তারা আরেকটি নতুন কমিটি গঠন করতেও রাজি হয়ে যায়, যারা একটি নতুন চুক্তি তৈরি করবে। সেই কমিটি মাত্র ১১ দিনে তাদের রিপোর্ট জমা দিয়ে দেয় এবং সেনা-বিজেপি সরকার ডি পি সি'র সঙ্গে আরেকটি নতুন চুক্তিও সই করে যার সঙ্গে আগের চুক্তির কার্যত কোন তফাৎই নেই। যদিও এটা আলাদা ঘটনা যে খুব শিগগিরই বিশ্বজুড়ে এনরণের ব্যবসা ডুবে যায় এবং এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র মহারাষ্ট্রের জন্য একটি সাদা হাতিতে পরিণত হয়।

এসব থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তার সারমর্ম হল বিজেপি সমেত আর এস এস ও তার সব শাখা সংগঠন অর্থনৈতিক নীতি (এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও) যতই জাতীয়তাবাদী ভড়ং আর বাগাড়ম্বর দেখাক, সেসব আসলে লোক দেখানো। যার লক্ষ্য হলো ভারতকে বিদেশি পুঁজির অনুকম্পার হাতে ছেড়ে দেবার এজেন্ডা অনুসরণ করার সময়ে সে সম্পর্কে মানুষের সন্দেহকে এড়িয়ে যাওয়া।

শ্রমিকশ্রেণি সম্পর্কে আর এস এস'র দৃষ্টিভঙ্গি

ডাঃ কে. হেমলতা

যে কোন সমাজে সম্পদ তৈরি করেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমজীবীরা, যারা মাঠে বা কারখানায় কাজ করেন। তাদের শ্রমে ঘামেই সৃষ্টি হয় সম্পদ। তাই সেই শ্রমকে স্বীকৃতি দিতে হয়, মর্যাদা দিতে হয়। শ্রমিকরা যে সম্পদ সৃষ্টি করে তা থেকে তাদের ন্যায্য অংশও পাওয়া উচিত। শ্রমের এই মর্যাদার স্বীকৃতি ও সম্মান যদি তারা না পান, তবে তাদের একত্রিত হবার এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার পূর্ণ অধিকার আছে যে সংগ্রামের মাধ্যমে তারা সমাজে তাদের উন্নত স্থান নিশ্চিত করতে পারেন।

কিন্তু শ্রমিকদের অধিকার ও সমাজে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে আর এস এস'র দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষের অস্তিত্বই আর এস এস স্বীকার করেনা।

শ্রমিক অধিকারের বিরুদ্ধে আর এস এস

আর এস এস নেতা গোলওয়ালকারের গ্রন্থ 'বাঞ্চ অফ থটস' যাকে আর এস এস কর্মীরা প্রায় বাইবেল জাতীয় কিছু বলে মনে করে তাতে গোলওয়ালকার লিখেছেন—

"সমাজের ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি সুবিধা হল, এটি শ্রেণিসংগ্রামকে পরিহার করে। আইন ও রীতিনীতি, পালনীয় কর্তব্যের পূর্ণ প্রকৃত নিয়ম না হলেও ভারতীয় সমাজ সৌহার্দ্যকেই সম্ভাবনা হিসেবে বিবেচনা করে।

গোষ্ঠী ও ব্যক্তির আচরণের নির্ণায়ক হিসেবে ধর্ম পরস্পর বিরোধী দলগুলির দাবির একটি সংশ্লেষকেই উপস্থিত করে। বিবদমান গোষ্ঠীগুলি সমাজে যে কাজ করে, তারা যে সেবা দেয় সেই দৃষ্টিকোন থেকে নিরপেক্ষভাবে দেখলেই সবার দাবির মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের উপকরণ পাওয়া যাবে।

পঞ্চায়েত যেসব মূল্য এবং স্বার্থের সংশ্লেষকে প্রকাশ করে ধর্ম তাকেই বহিঃপ্রকাশ দেবে স্ফটিক কঠিন করে তুলবে। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তিতে সুদীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ভারতীয় আস্থার এটাই উৎস। এটা একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানভিত্তিক এবং নৈতিক। শ্রেণিসংগ্রামের বা বিভিন্ন কাজ ও শ্রেণির মধ্যে নিষ্পত্তি অযোগ্য বৈরিতার ধ্বংসাত্মক ভাবনাকে তাই সাফল্যের সঙ্গেই ভারতীয় চিন্তা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।" (ভূমিকা — পৃষ্ঠা ১১)

এসব কথা যখন লেখা হয়েছিল, যখন ভারত ব্রিটিশদের একটি উপনিবেশ, তখনও ব্রিটিশ ও ভারতীয় মালিকদের হাতে শ্রমিকদের দুরবস্থা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা গেছিল যে মিল মালিকরা উন্নততর কাজের পরিবেশের জন্য শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিকে দাবিয়ে রাখতে ব্রিটিশদের সাহায্য নেওয়াই বেশি পছন্দ করবে। বোম্বের টেক্সটাইল মিল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট ভাঙতে ভারতীয় মালিকদের হয়েই ব্রিটিশ শাসনাধীন পুলিশ তীব্র নিপীড়ন চালিয়েছিল।

এই এতগুলি দশকে আর এস এস কি এমন একটিও উদাহরণ দেখাতে পারবে যেখানে মালিকরা স্বেচ্ছায় তাদের মুনাফা শ্রমিকদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে? নিজেদের ইতিহাস থেকে আর এস এস কি একটিও এমন শিল্প বিরোধের কথা বলতে পারবে, যেখানে তারা শ্রমিকদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করেছে? সামাজিক সম্প্রীতির নামে তারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার অধিকারীদের সঙ্গে, যাদের এসব ক্ষমতা নেই, তাদের সমান করে দিতে চায়। আর ধ্বংস করে দিতে চায় যাদের কিছু নেই তাদের ঐক্য ও সংগঠনের শক্তিকে।

মুনাফাই সবার উপরে

একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে পুঁজিবাদী সমাজে মুনাফাই হল চালিকাশক্তি। মুনাফার প্রধান উৎস কি? শ্রমিকদের শ্রমের শোষণই মুনাফার প্রধান উৎস। ভারতে নয়া উদারবাদী নীতি কার্যকর হবার পর থেকে মালিকপক্ষের এবং কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন একের পর এক সরকারের প্রধান প্রয়াস ছিল স্থায়ী কাজের চরিত্র বদলে অস্থায়ী ও কন্ট্রাক্টভিত্তিক কাজ। এতে একদিকে যেমন মুনাফা বেড়েছে, অন্যদিকে অসাম্য তীব্রতর হয়েছে। মোট সংযুক্ত মূল্যের অংশ

হিসেবে শ্রমিকের মজুরির ভাগ ভীষণভাবেই কমেছে।

গোলওয়ালকার মনে করেন " মানুষ যেখানে নিজের জন্য মুনাফা নিশ্চিত করতে পারে না, সেখানে সে তার কাজ করার ইচ্ছা ও ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারে না। আমাদের এই বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।" তাই আর এস এস'র দৃষ্টিভঙ্গিতে মালিকের আরও বেশি মুনাফার বাসনা একেবারেই ন্যায্য। কিন্তু শ্রমিকরা যদি লড়াই করার জন্য সংগঠিত হয়, সেটা তার মতে " ভারতীয় পথ" নয়।

গোলওয়ালকার শ্রমিকদের " অধিকারের " দাবিকে তাচ্ছিল্য করেন। তিনি বলছেন " আজ আমরা সর্বত্র 'অধিকার' নিয়ে হইচই শুনি। আমাদের সব রাজনৈতিক দলগুলিও অনবরত এদের 'অধিকার' এর কথা বলে জনগণের অভিমান বাড়িয়ে তুলছে। কোথাও 'কর্তব্য' এবং নিস্বার্থ সেবার ভাবনার ওপর কোন জোর দেওয়া হচ্ছে না। সমাজের আত্মা হল সহযোগিতার মনোভাব; কিন্তু জেদি অধিকার প্রকাশের এই পরিবেশে এই মনোভাবের টিকে থাকা কঠিন। সেজন্যই আমরা আজ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে, শ্রমিক ও শিল্পপতিদের মধ্যে সংঘাত দেখাতে পাচ্ছি।"

আর এস এস নেতারা আজও এসব তত্ত্বেই বিশ্বাস করেন। মোহন ভাগবতকে আপনি কখনোই শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলতে শুনবেন না।

বর্ধিত শোষণ

আজকের পরিস্থিতির দিকে তাকান। ১৯৯৮ সালে সংগঠিত ক্ষেত্রে মোট কর্মসংস্থানের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮২ লক্ষ। এক দশক পর তা কমে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সংগঠিত ক্ষেত্রে ১৯৮০'র দশকে মোট সংযুক্ত মূল্যের ৩০ শতাংশ ছিল শ্রমিকদের মজুরির অংশ (বার্ষিক শিল্প সমীক্ষার তথ্য অনুযায়ী)। ১৯৯০'র দশকে তা কমে ২০ শতাংশের কাছাকাছি দাঁড়ায়। আর ২০০৮-০৯ সালে তা কমতে কমতে ১০ শতাংশে ঠেকেছে যা ইতিহাসে সর্বনিম্ন।

অন্যদিকে গোটা ১৯৮০'র দশকেই মোট মুল্য সংযুক্তিতে মুনাফার ভাগ মজুরির ভাগের চেয়ে কম ছিল। পরিমাণ ছিল ২০ শতাংশ। ১৯৯০'র দশকে

উদারিকরণের পর এটা মজুরির অংশের চেয়ে বেড়ে ৩০ শতাংশ হয়। ২০০১ থেকেই এটা বাড়তে শুরু করে এবং ২০০৮ সালে মুনাফার অংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬০ শতাংশ। ১৯৯৯-২০০০ এ কারখানায় মোট কর্মশক্তির ২০ শতাংশ ছিলেন ঠিকা শ্রমিকরা। ২০০৮-০৯ এ বাড়তে বাড়তে ঠিকা শ্রমিকরাই হয়ে দাঁড়ান ৩২ শতাংশ। এই ঠিকা শ্রমিকদের একদিকে যেমন কাজের নিরাপত্তা নেই তেমনি এরা সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। আর এস এস'র দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের মিথ এবং বাস্তবতা শ্রমিকশ্রেণির ওপর বেড়ে চলা শোষণ— এ থেকেই স্পষ্ট।

শ্রম 'সংস্কার'

আর এস এস'র কায়দায় সামাজিক সম্প্রীতি নিশ্চিত করার জন্যই মোদি সরকার এমন একগুচ্ছ আইন আনছে যা শ্রমিকদের অধিকার খর্ব করবে এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তার বিলোপসাধনই করে দেবে। এইসব শ্রমিক বিরোধী শ্রম আইন "সংস্কার" কে আর এস এস সমর্থন করে। সেই সঙ্গে কর্পোরেটদের ওপর কম কর চাপাবারও পক্ষে আর এস এস।

করের বিরুদ্ধে

ভারতের উন্নয়নের জন্য সম্পদ কোথা থেকে আসবে? বিশ্বের সব দেশে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কর্পোরেটদের থেকে আদায় করা করের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। বিশ্বে সবচেয়ে কম করের হার যেসব দেশে, ভারত তার অন্যতম। এছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে বিপুল কর ছাড়। ইউ পি এ সরকার হোক বা মোদি সরকার, প্রতিবছর ৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি করছাড় দেওয়া হচ্ছে কর্পোরেটদের। টাকার এই পরিমাণ সামাজিক ক্ষেত্রের সব কর্মসূচির মোট বরাদ্দের চেয়েও বেশি।

আর এস এস'র মতে এটাই দেশপ্রেম। তারা মনে করে কর্পোরেটদের ওপর কর চাপানো প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। ভাষা অন্যরকম হলেও মোদি বা জেটলি আজ যা বলেন, আর বহু বছর আগে মোদির " গুরুজি" যা বলতেন, তার সারমর্ম প্রায় হুবুহু এক। তিনি বলেন, " সরকার এত বেশি কর চাপায় যে,

একটা স্তর পেরিয়ে যাবার পর যিনি উৎপাদন করেন তিনি ১০০ টাকার থেকে বড়জোর আড়াই টাকা পাবেন। এমন অবস্থায় উৎপাদক স্বাভাবিকভাবেই ভাবেন যে এভাবে উৎপাদন করা অর্থহীন"। আর এস এস'র চোখে উৎপাদক কে? প্রকৃত উৎপাদক শ্রমিক নন। পুজিপতিই আর এস এস'র চোখে উৎপাদক। যেহেতু কর মুনাফার পরিমাণ কমিয়ে দেয়, তাই কর যাই থাকুক, আর এস এস চায় কম পরিমাণ কর।

মন্দির : আর এস এস'র সমাধান সূত্র

তাহলে আর এস এস'র মতে সমাধান কী? 'মানবিক স্পর্শ, 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক অক্ষমতা থেকে জন্ম নেওয়া দুঃখ যন্ত্রনার অশ্রু মোছাবার" ভাল ভাল কথার মধ্যেও আর এস এসের তরফে মালিকদের প্রতি কিছু সুনির্দিষ্ট পরামর্শ আছে। গোলওয়ালকার লিখেছেন , " ..... তাদের উচিত, প্রতিটি কারখানা চত্বর বা শ্রমিক কলোনীতে একটি মন্দির তৈরি করা এবং সাপ্তাহিক ভজন পূজন, ধর্মীয় আলোচনা ও হরিকথার আয়োজন করা।"

এই উপদেশ অধিকাংশ মালিক প্রায় ধর্মীয় আদেশের মতোই মান্য করেন। অধিকাংশ শিল্প তালুকে মালিকরা মন্দির বানিয়েছেন। সেখানে আয়োজিত পূজায় যাতে সব শ্রমিকরা অংশ নেয় তা নিশ্চিত করা পুরোহিতের দায়িত্ব। ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার আচরণ ব্যক্তিগত বিশ্বাস। কিন্তু মালিক যদি হিন্দু হন এবং বিভিন্ন ধর্মের শ্রমিকরা যেখানে কাজ করেন সেখানে যদি তিনি নিজের ধর্মের উপাসনাস্থল তৈরি করেন, তার ফল কী হবে? গোলওয়ালকারের এই উপদেশের লক্ষ্য কী? কারখানায় বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী শ্রমিকরা থাকতে পারেন। একটি কারখানায় শুধুমাত্র একটি ধর্মের উপাসনাস্থল রাখা, ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী শ্রমিকদের জন্য বৈষম্যমূলক। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো এর ফলে ধর্মের ভিত্তিতে শ্রমিকদের মধ্যে পৃথকীকরণ ও বিভাজন সৃষ্টি হয়। কারখানার কাজ শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করে। কিন্তু কারখানার মধ্যেই শ্রমিকদের ভাগ করার হাতিয়ার হয় ধর্ম। এটাই আর এস এস'র লক্ষ্য।

আর এস এস'র মতাদর্শের প্রয়োগ : ২ সেপ্টেম্বরের সাধারণ ধর্মঘটে বিশ্বাসঘাতকতা

আর এস এস'র মতাদর্শ অনুযায়ী সংঘ পরিবারের গর্বিত সদস্য ভারতীয় মজদুর সংঘ ঘোষণা করেছে, যে তারা " শ্রেণিসংঘাতের তত্ত্ব বাতিল করে এই ধারণাতেই জোর দেয় যে সব অংশীদারদেরই যুথবদ্ধভাবে কাজ করা উচিত। শিল্পের মধ্যে 'পরিবার' এর ধারণার বিকাশ ঘটিয়ে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। বি এম এস-ও দাবি করে যে,তারা 'সর্বোচ্চ উৎপাদন ও সংযমের সঙ্গে ভোগ' এর ভাবনা প্রচার করে। সুতরাং শ্রমিকরা মালিকদের আরও মুনাফার জন্য সর্বোচ্চ উৎপাদন করতে হবে। কিন্তু ভোগ করতে হবে সংযমের সঙ্গে। সুতরাং মালিকদের কাছে বেশি মজুরির কোন দাবি করা যাবে না।

বি এম এস'র ৬০ বছর উপলক্ষে তাদের মুখপত্র 'বিশ্বকর্মা সংকেত' এর সম্পাদকীয়তে দাবি করা হয়, ' থেংডিজী (বি এম এস'র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক) সাফল্যের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলি মৌলিক ভাবনা এবং ম্যানেজমেন্ট সমস্যা ও সেসব সমস্যা সমাধানের পন্থা সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তিনি শ্রেণিসংঘাতের তত্ত্বটিকে ভেঙে দিয়েছেন এবং সামনে এনেছেন ম্যানেজমেন্ট ও শ্রমিকদের মধ্যে অংশীদারির একটি সম্পর্ককে যেখানে একটা অন্যটাকে ছাড়া না চলতে পারে।"

২০১৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘট যা থেকে শেষ মুহূর্তে বি এম এস সরে আসে, তা সংগ্রামের প্রতি বি এম এস'র এই দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচায়ক। সেই সঙ্গে অন্য সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, যারা এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এবং তা সফল করতে এগিয়েও যায়, তাদের এই ভূমিকা বি এম এস'র এই দাবিকেও ভুল প্রমাণ করে যে তারা " ট্রেড ইউনিয়নগুলির মৌলিক ভাবনার পরিবর্তন" ঘটিয়ে দিয়েছে।

২০১৪ সালে বিজেপি'র নির্বাচনী ইস্তেহারেও একই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে, যাতে বলা হয়, " সংগঠিত শ্রমের ক্ষেত্রে, আমরা চাই শিল্প মালিক ও শ্রমিকরা, 'শিল্প পরিবার ' এর ধারণাকে গ্রহণ করুক। এই ধারণা, যেখানে শিল্প মালিক ও শ্রমিকরা একটি পরিবার হিসেবে যুক্ত হন, তার চালিকা নীতি হল

দক্ষতা, ক্ষমতার উন্নয়ন ও উন্নীতকরণ, উৎপাদনশীলতা, উপযুক্ত মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা এবং নিরাপত্তা"। অর্থাৎ শ্রমিকদের জন্য সংগঠনের অধিকার বা যৌথ দর কষাকষির অধিকারের কোন গ্যারান্টি নেই!

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি

আর এস এস'র হিন্দুত্ব মতাদর্শ অনুযায়ী শ্রমিক এবং মালিকরা একই পরিবারের সদস্য, কিন্তু শ্রমিকরা সবাই এক পরিবারের সদস্য নন। 'পরিবার' 'সম্প্রীতি' ইত্যাদি সংক্রান্ত সব কথা উবে যায় যখন শ্রমিকদের একতা গড়ে তোলার কথা আসে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, একদিকে আর এস এস বলে মালিক ও শ্রমিকরা মিলে একটি 'পরিবার' অথচ শ্রমিকরা যখন মালিকের সঙ্গে একই ধর্ম জাত, অঞ্চল বা লিঙ্গের হওয়া সত্ত্বেও বা না হয়েও মালিকের হাতে শোষিত হন, তখন সেই শ্রমিকদের এক 'পরিবার' বলে গণ্য করা হয় না। নিজেদের 'হিন্দুত্ব' প্রকল্পের সাফল্যের জন্য সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তৈরির চেষ্টায় আর এস এস ও তার বিভিন্ন সংগঠনগুলি শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করে।

সাম্প্রদায়িক হিংসার এমন অনেক ঘটনা আছে, যেখানে বিশেষ করে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত হিন্দু শ্রমিকদের উস্কানি দেওয়া হয়েছে, তাদের সেই মুসলিম ভাইদের আক্রমণ করতে, যাদের সঙ্গে তাদের কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা বা ঝগড়া ছিল না। আর এস এস'র রাজনৈতিক শাখা বিজেপি'র ঘনিষ্ঠ সহযোগী শিবসেনা জাতীয় ও বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থে ১৯৮০'র দশকে বোম্বের একদা শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে ভাঙার জন্য সুপরিচিত এবং তখন থেকে এরা একটি প্রোটেকশন র‍্যাকেটও চালিয়েছে। ভূমিপুত্রদের জন্য কাজের ব্যবস্থার অজুহাতে এরা কেরালা বা অন্যান্য দক্ষিণী রাজ্য, বা উত্তর প্রদেশ, বিহার কিংবা আসাম থেকে মহারাষ্ট্রে আসা শ্রমিকদের ওপর আক্রমণও চালিয়েছে বেশ কয়েকবার।

এভাবেই ধর্ম, অঞ্চল এসবের নামে শ্রমিকদের ভাগ করা হয় আর তাদের নিজেদের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনকে লড়িয়ে দেওয়া হয় যাতে সব ধর্ম, বা ভাষার শ্রমিকদের অবাধে শোষণ চালিয়ে যেতে পারে মালিকরা। এসব

কাদের স্বার্থ সিদ্ধ করে? ' শ্রেণিসংঘাত' কে বর্জন করার নামে আর এস এস আসলে যা করে তা হল মালিকদের বৃহৎ জাতীয় ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির স্বার্থরক্ষা।

সামাজিক মাত্রা

আমাদের দেশে শ্রমশক্তির ৯৪ শতাংশের বেশি যুক্ত রয়েছেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এই শ্রমিকদের এক বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ , কৃষিতেই কাজ করুন বা শিল্পে — তারা সামাজিকভাবে নিপীড়িত অংশের মানুষ। এই তথাকথিত 'শূদ্র' এবং মহিলাদের প্রতি আর এস এস'র মনোভাব কী? মনুস্মৃতির কট্টর সমর্থক হিসেবে সমাজের সর্বাধিক সামাজিকভাবে নিপীড়িত অংশ দলিত শ্রমিকদের প্রতি এদের মনোভাব কী?

এক্ষেত্রে প্রাক্তণ আর এস এস প্রচারক এবং আজ দেশের সর্বোচ্চ সাংধিনিক পদ প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসা নরেন্দ্র মোদির মতামতের কথা স্মরণ করাই যথেষ্ট হবে। ২০০৭ সালে তিনি যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী তখন আই এ এস আধিকারিকদের উদ্দেশে তাঁর বক্তৃতামালার একটি সংকলন প্রকাশিত হয় যার নাম ' কর্মযোগ'। এই বইতে তিনি মানুষের হাতে ময়লা সাফাইকে 'আধ্যত্মিকতার একটি অভিজ্ঞতা' বলে উল্লেখ করেন। বাল্মীকি সম্প্রদায়ের লোকেদের নিজের হাতে ময়লা সাফাইয়ের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মোদি লিখেছেন, " আমি বিশ্বাস করি না যে এরা এই কাজ শুধুই জীবিকা নির্বাহের জন্য করছেন। যদি তাই হতো, তাহলে এরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই কাজ করতেন না।.....কোন একটা সময়ে কেউ নিশ্চয়ই এই জ্ঞানালোক পেয়েছিল যে, এটাই তাদের (বাল্মীকিদের) কাজ, গোটা সমাজের খুশির জন্য এবং ঈশ্বরের জন্য। এরা বুঝেছেন, যে তাদের ওপর ভগবানের ন্যস্ত করা এই কাজ তাদের করতে হবে এবং সাফাই করারই এই কাজ তাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে করে যেতে হবে, এক অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক কর্তব্য হিসেবে। এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে , এদের পূর্বপুরুষদের কাছে অন্য কোন পেশা বা ব্যবসা বেছে নেবার সুযোগ ছিল না।"

আবার ২০০৯ সালে সাফাই কর্মচারীদের এক সভায় মোদি, সাফাই কর্মীদের এই অন্যদের ময়লা পরিষ্কার করার কাজকে একজন মন্দিরের পুরোহিতের কাজের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বলেন, " উপাসনার আগে পুরোহিত যেমন প্রতিদিন মন্দির পরিষ্কার করেন, তেমনি আপনারাও শহরকে মন্দিরের মতো পরিস্কার করেন। আপনারা এবং মন্দিরের পুরোহিতরা একই রকম কাজ করেন।" যাদের দেশের অধিকাংশ এলাকায় মন্দিরেও ঢুকতে দেওয়া হয়না সেই সাফাই কর্মচারী এবং দলিতদের সেই পুরোহিতদের সঙ্গে তুলনা করা, যারা তাদের বিরুদ্ধে এই অপরাধ সংঘটিত করে, একটা নির্মম রসিকতা নয় কি? একজন দলিত কবি সঠিকভাবেই লিখেছেন, এই ধরনের কাজ করে এমন আন্তরিক আধ্যাত্মবোধের অভিজ্ঞতা তো উচ্চবর্ণের লোকেরাও পেতে পারেন। তাহলে এমন জ্ঞানোদয় তাদের ক্ষেত্রে হয় না কেন?

মহিলাদের সম্পর্কে এবং সমাজের তাদের ভূমিকা সম্পর্কে সবচেয়ে বৈষম্যমূলক এবং জঘন্য শিক্ষা যিনি দিয়েছেন সেই মনুর বিধান সবারই জানা। গোলওয়ালকার তাকেই 'বিশ্বের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আইন প্রণেতা' বলে মান্যতা দিয়েছেন। এসব বিধান ও শিক্ষাই আর এস এস'র মহিলা শাখাসহ বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে প্রচার করা হয়। তাদের মতে লৈঙ্গিক অধিকারের ধারণাটিই সহনীয় নয় কারণ তাতে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে মহিলাদের একটি অসুস্থ প্রতিযোগিতার জন্ম হয়। তা থেকে গার্হস্থ্য বিবাদ, অসন্তোষ, পরিবারে ভাঙনের মতো সমস্যার সৃষ্টি হয়। এটাই পুরুষ নিপীড়নের একমাত্র কারণ। এদের মতে মহিলাদের একমাত্র চরম অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা না থাকলে চাকরি করা উচিত নয়। যে আর এস এস মহিলাদের কর্মসংস্থান, মহিলাদের সমান অধিকারের বিরোধী, তারা কি কখনো মহিলাদের জন্য সমান মজুরি, পদোন্নতির সমান সুযোগের মতো দাবির সমর্থন করতে পারে?

আজ আর এস এস এর 'হিন্দুরাষ্ট্রের' প্রকল্পের জন্য সমর্থন জোগাড় করতে, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সমাজের মেরুকরণ করার জন্য, দেশে হিন্দুত্বের সাঁড়াশি মজবুত করে চেপে ধরতে, আর এস এস'র বিভিন্ন শাখা সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নিজেদের প্রভাব ছড়িয়ে দিতে চাইছে এবং সংখ্যালঘুদের

'শত্রু' হিসেবে তুলে ধরে তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলতে চাইছে। এরা শ্রমিক, দলিত, আদিবাসী সমেত শ্রমজীবী জনগণের বিভিন্ন অংশকে প্রকৃত শত্রুর বিরুদ্ধে সংগঠিত না করে লড়িয়ে দিচ্ছে নিজেদেরই ভাই বোনদের বিরুদ্ধে।

জনগণের প্রকৃত শত্রু ও শোষণমূলক 'পুঁজিবাদী' ব্যবস্থা এবং জাতীয় ও বহুজাতিক কর্পোরেট এবং আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির নির্দেশে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার যেসব নীতি নিয়ে চলছে, তার থেকে জনগণের মনযোগ সরিয়ে দেবারই কৌশল এটা।

শ্রমিকশ্রেণীকে আর এস এস'র এইসব কাজকর্ম সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে এবং তাদের ঐক্য বিঘ্নিত করার সব প্রয়াসকে পরাস্ত করতে হবে। ধর্ম, অঞ্চল, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সব শ্রমিক ও শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার আজ আরও তীব্রতায় যেসব নয়া উদারবাদী নীতি অনুসরণ করছে, তার বিরুদ্ধে এদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের একমাত্র পথ, যে সমাজে শ্রমজীবীরা মর্যাদার জীবন যাপন করতে পারবেন।